আজাদ হিন্দ ফৌজ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়
শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০১৯ – ২০২০
ইতিহাস বিভাগ
সেমেস্টার ঃ ৪ (অনার্স)
সি. সি. ঃ ৮

প্রশ্ন ঃ সপ্তদশ শতকে ইউরোপের প্রধান বাণিজ্যিক শক্তি হিসাবে স্পেনকে হঠিয়ে ইংরেজ ও ফরাসীরা কিভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে ?

উত্তর ঃ

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় অর্থনীতির প্রায় সব ক্ষেত্রে যে বিশাল কর্মকাণ্ড দেখা গিয়েছিল তার চালিকাশক্তি ছিল পুঁজিপতি বণিক শ্রেণী। ইউরোপীয় ইতিহাসের ঐই পর্যায়কে সেই কারণে বলা হয় 'বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের যুগ'। ষোড়শ শতক থেকে বিশ্বজনীন বাণিজ্য ব্যবস্থায় যে ইউরোপীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সপ্তদশ শতকেও তা অব্যাহত থাকে। কিন্তু বাণিজ্যিক পুঁজির ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের কল্যাণে বিশ্ববাণিজ্যের আধিপত্য স্পেন ও পর্তুগালের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের থেকে সরে এসে ডাচ, ফরাসী ও ইংরেজ বণিকদের হাতে ন্যস্ত হয়।

ষোড়শ শতকের স্পেন ও পর্তুগাল যৌথভাবে মহাসাগরীয় বাণিজ্যে যে আধিপত্য কায়েম করেছিল তার ভিত রাখা ছিল আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ায় তাদের ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে। সপ্তদশ শতকে মূলত আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশগুলি স্পেনীয় অভিবাসীদের উদ্যোগে অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে থাকে, ফলে আমেরিকা মহাদেশ থেকে সোনা-রূপা আমদানি অব্যাহত থাকলেও স্পেনের শিল্প বা কৃষিপণ্য রপ্তানি ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। পর্তুগালের এশীয় উপনিবেশগুলিও সপ্তদশ শতকে তাদের আঞ্চলিক স্বনির্ভরতা বাড়াতে সচেষ্ট হলে লিসবনের নিয়ন্ত্রণ দুর্বলতর হতে থাকে।

স্পেন এবং পর্তুগালের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য অবশ্য শুধু উপনিবেশগুলির অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্যই দুর্বল হয়েছিল, এমন নয়। ওই একই সময়ে হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স মহাসাগরীয় আধিপত্যের দাবিদার হয়ে দাঁড়ায়। এই তিন শক্তি আমেরিকা ও এশিয়ায় স্পেনীয় ও পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের ওপর চাপ সৃষ্টি করা ছাড়াও নিজস্ব উপনিবেশ স্থাপন করতে সচেষ্ট হয়। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের প্রায় প্রত্যেকটি দ্বীপে এই সময়ে ডাচ, ইংরেজ বা ফরাসী উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ইংল্যাণ্ড আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে মেরিল্যাণ্ড, ভার্জিনিয়া এবং ক্যারোলিনাতে উপনিবেশ স্থাপন করতে শুরু করে।

সপ্তদশ শতকে ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের যে রূপ দেখা দেয় তা ষোড়শ শতকের থেকে অনেকটা আলাদা ছিল। ষোড়শ শতকে পর্তুগিজরা ভূমধ্যসাগরীয় ফসল আখের চাষ প্রবর্তন করে তাদের উপনিবেশ ব্রাজিলে; যেখানে ক্ষেতমজুরের কাজে নিযুক্ত করা হত ক্রীতদাস বানানো আমেরিকান আদিবাসীদের। সপ্তদশ শতকে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের প্রায় সর্বত্রই দাসব্যবস্থাকে স্থায়ী অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপ দেওয়া হয়। ১৫৭৬ সালে আমেরিকা মহাদেশে আখের চাষের প্রায় ৪০ টি আবাদ ছিল। ১৭০০ সালের মধ্যে ওই সংখ্যা বেড়ে হয়ে যায় প্রায় ১৮০। একই সঙ্গে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে চিনি-কলের সংখ্যা। মোট উৎপাদন ১৫৭০ সালে ২০৫০ টন থেকে ১৬৭০ সালে ২২,৭০০ টনে দাঁড়ায়। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি ইংল্যাণ্ড একই পদ্ধতিতে মেরিল্যাণ্ড এবং ভার্জিনিয়াতে তামাকের চাষ শুরু করে। ক্যারিবিয়ান সাগরের বার্বাডোস দ্বীপে ইংরেজরা প্রথমে তামাকের চাষ শুরু করলেও ১৬৩০-এর পরে আখের চাষে সরে যেতে বাধ্য হয়।

ষোড়শ শতকের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার একটি পরিণাম ছিল মহামারী এবং ক্রীতদাসত্বের শিকার হয়ে স্থানীয় আদিবাসীদের প্রায় বিলুপ্তির মুখোমুখি হওয়া। এতে শ্রমশক্তির যে অভাব দেখা গিয়েছিল তা দূর করতে সুদূর আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস নিয়ে এসে আমেরিকার বিভিন্ন ক্ষেতে নিয়োগ করা শুরু হয়। সপ্তদশ শতকে আন্তর্মহাদেশীয় দাস-ব্যবসা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে ওঠে। গোড়াতে এই দাসব্যবসাতে পর্তুগীজদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। পরবর্তীকালে ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পর্তুগীজদের একচেটিয়া আধিপত্যে ভাগ বসাতে সক্ষম হয়। পর্তুগাল ব্রাজিলের দাসব্যবসায় ডাচদের প্রবেশাধিকার না দিলেও ডাচ বণিকরা স্পেন, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের উপনিবেশগুলিতে দাস সরবরাহ করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেতে থাকে। ১৬৭০ সাল অবধি ডাচরা ছিল পর্তুগীজদের পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম দাস সরবরাহকারী। ১৬৭৫ সাল নাগাদ ইংরেজরা দাস সরবরাহের ক্ষেত্রে ডাচদের ছাড়িয়ে যায় এবং ১৭০০ সালের মধ্যে ফরাসী দাসব্যবসাও ডাচদের ছাড়িয়ে যায়।

আন্তর্মহাদেশীয় বাণিজ্যচক্রের পারস্পরিক সম্পর্কের চরিত্র সম্যকভাবে বোঝা যায় ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল আফ্রিকান কোম্পানির বাণিজ্য-ব্যবস্থা দেখলে। ১৬৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা ১৬৭৩ থকে ১৭১১ সালের মধ্যে প্রতি বছর প্রায় ২৩২৭ দাস ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে পাঠাত। এছাড়াও আফ্রিকা থেকে সোনা, হাতির দাঁত, মোম প্রভৃতি জিনিস ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হত। বিনিময়ে আফ্রিকা পেত ধাতব পণ্য, পোশাক, বন্দুক, বারুদ এবং ছুরি-ছোরা। আফ্রিকা থেকে আসা ক্রীতদাসের বিনিময়ে ক্যারিবিয়ান অঞ্চল থেকে চিনি ইউরোপে রপ্তানি হত। অর্থাৎ সপ্তদশ শতকে ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার মধ্যে এক ত্রিভুজাকৃতি বাণিজ্যের প্রচলন ঘটে। এর পুরোভাগে ছিলেন পুঁজিপতি বণিকশ্রেণী।

আফ্রিকা এবং আমেরিকা থেকে আসা সোনার বিনিময়ে এশিয়া থেকে পণ্যসামগ্রী আমদানি করা শুরু হলে সপ্তদশ শতকে

Scanned with CamScanner

বিশ্বজনীন বাণিজ্যের চতুর্থ বাহুর উদ্ভব ঘটে। এশিয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ডাচ এবং ইংরেজ বণিকদের আগমন পর্তুগীজদের জন্য অশনি সংকেত বহন করে এনেছিল। পর্তুগীজরা এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্যের মৌলিক ধারাকে ব্যাহত করেনি, ফলে ১৬০০ সাল অবধি এশিয়া থেকে আসা পণ্যসামগ্রীর ৬০-৮০%-ই স্থলপথে পাশ্চাত্যের বাজারে পৌঁছাত। কিন্তু ওলন্দাজ ও ইংরেজরা ভারত মহাসাগরে আসার পরে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই ওলন্দাজ ও ইংরেজ নৌবহর ভারত মহাসাগরের এবং দূর প্রাচ্যের বাণিজ্য সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। প্রাচ্যের থেকে আমদানি হওয়া পণ্যেরও এই সময়ে পরিবর্তন দেখা যায়। ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পত্তন করা হয়েছিল প্রধানত ইস্ট ইণ্ডিজ থেকে মশলার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে। ১৬১৯-২১ সালে ওলন্দাজদের এশিয়া থেকে মোট আমদানির ৭৪% ছিল মশলা। ১৬৯৮ সালে ওই অনুপাত কমে ২২.৯% হয়ে যায়। বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে ওই সময়েই ৩১% থেকে বেড়ে ৫৪.৭% হয়ে যায়। ১৬৯০-এর দশকে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মোট আমদানির ৮৬.৬% ছিল বস্ত্রশিল্প জাত পণ্য। বিনিময়ে ইংরেজদের এশিয়া মুখী রপ্তানির প্রায় ৭৬% ছিল সোনা এবং রুপা। বাণিজ্যের এই ঘাটতির পরিমাণ কমাতে ইউরোপীয় বণিকরা আন্তঃএশিয় বাণিজ্যে বিনিয়োগ করলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে তা সোনা-রুপার রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি।

চতুর্ভুজাকার আন্তর্মহাদেশীয় বাণিজ্যের এই বিশাল আয়তন ইউরোপীয় পুঁজি ও বাণিজ্যে তার লগ্নির চরিত্রে বিস্তর পরিবর্তন এনেছিল। আন্তর্মহাদেশীয় বাণজ্যের ভৌগোলিক ব্যাপ্তির কারণে ঝুঁকি এত বেশী থাকত যে প্রয়োজনীয় পুঁজির যোগান কোন একটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থার পক্ষে দীর্ঘমেয়াদি ভাবে যোগান দেওয়া সম্ভব ছিল না। ষোড়শ শতকে তাই স্পেন ও পর্তুগীজ সরকার যথাক্রমে Casa de la contratacion এবং Casa de India নামক রাষ্ট্রায়ত্ত দুটি সংস্থার পত্তন করেন। পক্ষান্তরে সপ্তদশ শতাব্দীর উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের কোম্পানিগুলি সাধারণত রাষ্টের সনদ প্রাপ্ত হলেও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থা ছিল--যেমন, ইংল্যাণ্ডের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি (১৬০০ খ্রিঃ), ওলন্দাজদের সংযুক্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি (১৬০২ খ্রিঃ), ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি (১৬৬৪ খ্রিঃ) প্রভৃতি। এই প্রত্যেকটি সংস্থা রাষ্ট্রীয় সনদ পাওয়ার সুবাদে কার্যত আধা-সরকারি সংস্থা হিসেবে গণ্য হত। ফলে লগ্নি করা পুঁজি সম্পূর্ণ নষ্ট হওয়ার বিশেষ আশঙ্কা থাকত না। দ্বিতীয়ত, এই সংস্থাগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ছিল না, এগুলি ছিল সম্মিলিত পুঁজির সংস্থা বা 'জয়েণ্ট স্টক কোম্পানি'। ফলে ছোট বড় সমস্ত রকম পুঁজিই সংস্থায় লগ্নি করা যেত, এবং সেই সম্মিলিত পুঁজি বিনিয়োগ করা হত সুদূর বাণিজ্যে। বিনিয়োগ করা পুঁজির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই সংস্থাগুলি তাদের বিধিবদ্ধ খরচের মধ্যে নিরাপত্তা খাতে খরচ ধরে বাণিজ্যবহরগুলির সঙ্গে নিরাপত্তাবাহিনী পাঠাতে শুরু করে। এর ফলে জলদস্যু বা ভিনদেশের অনিশ্চিত আবহে পুঁজি বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমতে থাকে এবং আনুপাতিক হারে মহাসাগরীয় বাণিজ্যে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়তে থাকে।

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্পেন এবং পর্তুগাল পিছু হটতে থাকে। ১৬৪১-৫০ সালে স্পেনীয় বাণিজ্য বহর আতলান্তিক মহাসাগরে ২২,৫২৮ টন পণ্য বহন করে ; ১৭০১-১০ সময়কালে এটা কমে হয় ৪,৯৫০ টন। ১৬০১-১১ সময়কালে ৬৯টি জাহাজ পর্তুগাল থেকে এশিয়ার কি রওনা দেয় ; ১৬৯০-১৭০০ সময়কালে ওই সংখ্যা কমে হয় ২৩। অন্যদিকে ১৬০০-১৬১০ এবং ১৬৯০-১৭০০ এই দুই সমরে তুলনামূলক বিচার করলে এশিয়ামুখী ওলন্দাজ জাহাজের সংখ্যা হয়েছিল ৫৯ থেকে বেড়ে ২৪১, ইংরেজ জাহাজ ২০ থেকে বেড়ে ১৩৪ এবং ফরাসী জাহাজের সংখ্যা ২ থেকে বেড়ে ৪০। ওলন্দাজ বাণিজ্য ওই সময়কালে পাঁচগুণ বেড়ে যায়। ১৬৬৪-৭০ এবং ১৬৯১-১৭০০ সময়কালে ইংল্যাণ্ডের এশিয়া থেকে আমদানি ৭০% বেড়েছিল ; রপ্তানি বাড়ে ৫০%। তবে এই সময়ে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যের সবথেকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল পুনর্রপ্তানি বা re-exports । ঔপনিবেশিক পণ্যসামগ্রী (যেমন তামাক, চিনি, সুতির কাপড়) ইংল্যাণ্ডে আমদানি করে তা ইউরোপের বাজারে বিক্রি করে ইংল্যাণ্ড বিশাল লাভ করতে থাকে।

সপ্তদশ শতকের শেষ লগ্নে লণ্ডনের উত্থানের আগে পর্যন্ত এই বিশ্বজনীন ধনতান্ত্রিক বিনিময় ব্যবস্থার কেন্দ্র ছিল আমস্টারডাম। আমস্টারডাম ছিল এই সময় বিশ্বের বৃহত্তম পুঁজির বাজার। এই শহরের লোকসংখ্যা ১৫৬৭ সালে ছিল ৩০,০০০। বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির সুবাদে ১৭৮০ সালে ওই সংখ্যা ২০০,০০০ ছাড়িয়ে যায়। ১৫৮৫ সালে আমস্টারডামের বাজারে ২০৫ ধরনের পণ্য কেনা-বেচা হয় ; ১৬৭৫ সালে ওই সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় ৪৯১ (ওই বছর লণ্ডনে পণ্যের সংখ্যা ছিল ৩০৫)। সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকেই বিভিন্ন 'জয়েণ্ট স্টক কোম্পানি'-র শেয়ার কেনা-বেচা করার জন্য আমস্টারডামে শেয়ার বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে বহু বদেশী সরকারও তাদের ঋণপত্র (government bonds) ওই বাজারে বিক্রি করে টাকা তুলতে সচেষ্ট হয়।

বিশ্বপুঁজির বাজারে আমস্টারডামের এই অভূতপূর্ব অবস্থানের অন্যতম কারণ ছিল ১৬০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত Wisselbank । এই ব্যাঙ্ক জেনোয়ার ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কার্যত নিরঙ্কুশ আধিপত্যের অবসান ঘটায়। এই ব্যাঙ্কের মূল কাজ ছিল 'clearing house function'। বিভিন্ন বাণিজ্যপথের সংযোগস্থলে বাণিজ্যের সুবাদে যে অর্থাগম হয়ে থাকে নিরাপত্তার স্বার্থে তা কোনও বণিকের কাছে জমা রেখে বিনিময়-পত্র (bills of exchange), প্রভৃতির মাধ্যমে পুঁজি স্থানান্তর করা হত। এধরনের বিনিময়-পত্র বণ্টন ছিল সেই যুগের ব্যাঙ্কিং পরিষেবার মূল বৈশিষ্ট্য। সাধারণত যেখানে সর্বাধিক প্রান্ত থেকে পাওয়া বিনিময়-পত্র ভাঙানো যেত, সেই জায়গাকে বলা হত clearing house। সপ্তদশ শতকে Wisselbank-এর সৌজন্যে ওই শিরোপা লাভ করে আমস্টারডাম। ফলে আমস্টারডাম ইউরোপের বৃহত্তম সোনা-রুপার বাজারে পরিণত হয়। আমেরিকা থেকে আসা ১৫-২৫% সোনা সরাসরি স্পেন থেকে আমস্টারডামে পাঠিয়ে দেওয়া হতে শুরু করে সপ্তদশ শতকে, যাতে স্পেনের সঙ্গে নেদারল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক ঘাটতি পুষিয়ে নেওয়া যায়। প্রায় সমান পরিমাণ সোনা-রুপা আমস্টারডামে আসত অন্যান্য সূত্রে। এর ফলে আমস্টারডামে পুঁজির যে প্রাচুর্য দেখা দেয় তাতে ওলন্দাজদের পক্ষে পুঁজি রপ্তানি করা সম্ভব হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

ওলন্দাজদের এই সাফল্য দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইংল্যাণ্ড পুঁজির বাজার হিসেবে ডাচ প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামে। বিশ্বের প্রায় সব প্রান্তেই ওলন্দাজ বণিকদের মধ্যস্থতার অবসান ঘটাতে সচেষ্ট হয়ে ইংল্যাণ্ড নিজেকে হল্যাণ্ডের বিকল্প হিসেবে তুলে ধরে। ইংল্যাণ্ড সবথেকে বেশী জোর দিয়েছিল তাদের ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের উপনিবেশের সঙ্গে ওলন্দাজদের বাণিজ্যিক সম্পর্কের অবসান ঘটানোতে। ১৬৫২-৫৪, ১৬৬৫-৬৭ ও ১৬৭২-৭৪ সালে ইঙ্গ-ডাচ বাণিজ্যিক যুদ্ধ এবং ১৬৫১, ১৬৬০, ১৬৬২, ১৬৬৯, ১৬৭৩ ও ১৬৯৬ সালের নৌ-চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত আইন (Navigation Acts) এই প্রচেষ্টার প্রতিফলন। ক্রিস্টোফার হিলের মতে এই আইনগুলি স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় যে, বেসরকারী মালিকানাধীন ব্যবসায়ী সংস্থার স্বাধীনতা ততক্ষণই বজায় থাকবে যতক্ষণ তা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলে গণ্য করা হবে না।

ওলন্দাজদের সঙ্গে ইংরেজদের এই প্রতিযোগিতার দরুণ ইংল্যাণ্ড ইউরোপের বৃহত্তম বাণিজ্যিক শক্তিতে পরিণত হয়। ১৬২৯-১৬৮৬ সময়কালে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যপোতের সংখ্যা তিনগুণ হয়েছিল, যদিও তখনও ওলন্দাজ বাণিজ্য বহর আরও বড়ো ছিল। কিন্তু ১৬৬৩ থেকে ১৭০১ সালের মধ্যে re-exports-এর পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যাওয়াতে ইংল্যাণ্ড বিশ্ববাণিজ্যের ভরকেন্দ্রে পরিণত হতে শুরু করে। রপ্তানি বাণিজ্যের দিগন্ত বহুগুণ সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে এক শতাব্দী আগেও যে পুঁজি কৃষিতে লগ্নি করা হত তা বাণিজ্যে বিনিয়োগ করা শুরু হয়। ফলে সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ইংল্যাণ্ডের যে কোনো ভাল বাণিজ্যিক উদ্যোগে পুঁজি বিনিয়োগ করতে লগ্নিকারীর সংখ্যা অনেক বেশী বৃদ্ধি পায়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ১৬৯০-এর দশকে ইংল্যাণ্ডে প্রথম উল্লেখযোগ্য শেয়ার বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৯৪ সালে ইংল্যাণ্ডের জাতীয় দেনার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে **ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড** প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিবাচক মনোভাবের এই আবহে অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকেই কিছু নতুন ব্যাঙ্কিং পরিষেবার মাধ্যমে লণ্ডন বিশ্বপুঁজির ভরকেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি পেতে শুরু করে।

---

p.m.

Scanned with CamScanner